অভিসরণ
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue I, January 2026, PP. 28-47
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার কবিদের কবিতায় দলিত প্রসঙ্গ

রুমা মাহাত
গবেষক, মেদিনীপুর কলেজ(অটোনমাস), পশ্চিমবঙ্গ,ভারত

ভারতবর্ষের জনসমাজে একটি আলোচিত শব্দ হল 'দলিত'। 'দলন' থেকে (দল+অনট = দলন>দলিত); এই 'দলিত' শব্দটি এসেছে; যার অর্থ হল অবদমিত, মর্দিত, পিষ্ট। 'সাবঅলটার্ন' ধারণার সমগোত্রীয় শব্দ হলেও 'দলিত' বলতে সমাজবিজ্ঞানে একটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ সাধারভাবে 'দলিত' শব্দটি সমাজে যারা শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, দমিত এবং পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়। 'সভ্যতা', 'সংস্কৃতি', 'শিক্ষা', প্রভৃতি শব্দগুলি সার্বিক এবং সার্বজনীন অর্থে প্রযুক্ত হলেও আসলে কিন্তু তা বৈদিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে আর্যরা ভারতবর্ষে আসে। আর্যরা ভারতীয় জনসমাজকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছিল। যথা— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সমাজের এই তিন শ্রেণির মানুষদের সেবা করত শূদ্ররা। এরা উচ্চবর্ণের মানুষদের কাছে ছিল অস্পৃশ্য বা নিম্নশ্রেণির। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনকালে এরাই দলিত নামে পরিচিত হয়। বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থার একটি সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস বলেছেন—

"ভারতীয় প্রেক্ষাপটে যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধর্ম-সামাজিক কাঠামোয় তলানি অবস্থানে থাকছেন, আত্মোন্নতির চেষ্টা করছেন, অথচ উচ্চবর্গীয় মানুষ— যাঁদের অধিকাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধর্ম-সামাজিক বিধি-বিধানের সুযোগপ্রাপ্ত বলেই উচ্চাসনে আসীন— তাঁদের দ্বারা নিরন্তর বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন যাঁরা, ব্যাহত হচ্ছে যাঁদের আত্মোন্নয়নের প্রয়াস— তাঁরাই দলিত।"**১**

এই সমস্ত জনজাতির মানুষেরা হল ভারতবর্ষের মূল অধিবাসী। একটি বিশেষ শ্রেণির মানুষদের 'দলিত' বলা হয়। যারা সমাজে উচ্চ শ্রেণির মানুষদের দ্বারা শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত ও অত্যাচারিত হয়। সমাজে এই সমস্ত দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণির মানুষেরা অর্থনৈতিকভাবেও দুর্বল হয়। দারিদ্র্যতা ও অভাব এদের নিত্য সঙ্গী হয়ে উঠেছে। কোনো রকমে একবেলা খাবার খেয়ে দিনযাপন করে থাকে। একদিকে ড. বি. আর. আম্বেদকর দলিত মানুষদের সম্পর্কে বলেছেন- "আমরা অবদমিত শ্রেণি হিন্দুদের থেকে স্পষ্ট পৃথকীকরণ দাবী করি। রাজনৈতিক কারণে আমাদের হিন্দু বলা হয় কিন্তু সামাজিকভাবে হিন্দুরা কখনোই আমাদের ভাই বলে স্বীকার করে না"।**২** অন্যদিকে গান্ধিজী বলেন দলিত সমস্যা সামাজিক সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা নয়।**৩**

দলিত সম্পর্কে দেবী চ্যাটার্জী বলেছেন—

"দলিত কথাটির অর্থ এমন বস্তু বা মানুষ যাদের কেটে ফেলা হয়েছে, ভেঙে ফেলা হয়েছে, টুকরো টুকরো করে পিষে ফেলা হয়েছে ও ধ্বংস করা হয়েছে।"৪

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার এই অঞ্চলে বসবাসকারী দলিত বা আদিবাসী বা মূলবাসী বা আদিম উপজাতি যারা তাদের অভাব ও দারিদ্র্যতার কথা দেখা যায় ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালের 'গণশক্তি' সংবাদপত্রের একটি সংবাদে- "বিনপুর ২নং ব্লকের শিমূলপাল গ্রাম পঞ্চায়েতের মাথাভাঙ্গা গ্রামের মঙ্গল শবর, সুনীল মুর্মু, হরিপদ মাহাত ২০১৫ সালের ৩১ আগস্ট ভোরবেলায় পিঁপড়ের ডিম সংগ্রহ করার জন্য জঙ্গলে গেলে যৌথবাহিনী তাদের আটক করে। ডিম সংগ্রহকারীদের বক্তব্য তারা নাকি মাছ ধরার খাদ্যের জন্য পিঁপড়ের ডিম বিক্রি করে উপার্জন করে। এছাড়া তাদের সঙ্গে ছিল খাবার হিসেবে পান্তাভাত"৫

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার এই অঞ্চলের কবিদের কবিতায় দলিত মানুষদের শোষণের ও অত্যাচারের ছবি দেখা যায়। কবি সুধীর করণ তাঁর কবিতায় দলিতদের অত্যাচারের কথা ফুটিয়ে তুলেছেন—

"পড়েটে পাঁই টাপুর টুপুর ভিজেটে কুয়া বই

হে মোর ভাঙা কুড়িয়া ঘরে হাটুয়ে লেখা পাঁই"।

কবি ভবতোষ শতপথীর কবিতাতেও আমরা দেখতে পাই দলিত মানুষদের সমাজ, দারিদ্রতা, শোষণ, পীড়ন, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও অত্যাচারের কথা—

"এমন ঘরে জন্ম দিলি কেন আমার মা!

সারাটা রাত জল পড়ছে; পাতা নড়ছে না।"

কবি ভবতোষ শতপথীর কবিতায় দেখা যায় গ্রামের দরিদ্র দলিত গরীব মানুষদের শোষণের চিত্র—

"রক্তে বোনা ধান মরেছে,

দেনার ওপর দেনা,

সারা বছর হলো না হায়!

ঢেঁকিতে ধান ভানা।"

কবি তাঁর কবিতায় এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেন, কারা ব্রাহ্মণ, কারা বা দলিত আর কারাই বা চণ্ডাল—

"অসভ্যের সভাকবি মানিনা নিষিদ্ধ ফলাফল
ব্রাহ্মণের পৈতা ছিঁড়ে-হাহাকারে হয়েছি চণ্ডাল।"

নিম্নশ্রেণি অর্থাৎ হাড়ি, ডোম, বাগদী, মুচি, মেথর, কামার, কুমোর, জেলে, নাপিত, ধোপা, কলু, ময়রা, যুগি,

মাঝি, লোহার, প্রভৃতি মানুষেরা শালপাতা, জঙ্গলের ঝাঁটিকাঠ, কাঠ, দাঁতনকাঠি, মহুল, মধু, কেন্দু, পরব ছাতু (মাশরুম) তাল, খেজুর, হরিতকি, খেজুর ডাল, বাবুই ঘাস, বাঁশের ঝুড়ি, কুলো, গেঁড়ি-গুগলি, মরা পশুর চামড়া প্রভৃতি বিক্রি করে আয়-উপার্জন করে থাকে। তবে এই শ্রেণির কিছু মানুষ চাষ-আবাদ করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিও হয়েছে। এই উন্নতিটি তবে তাদের মধ্যে দেখা যায় যারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিভিন্ন পেশায় কর্মরত বা যারা জমি কিনে জমির মালিক হয়েছেন। বর্তমানে এখনো অনেক মানুষ আছে যারা দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে থাকেন।

ঝাড়গ্রাম জেলার কবি ভবতোষ শতপথী তাঁর কবিতা ও গানের মধ্য দিয়ে দলিত সমাজের জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। এমনকি পুরুলিয়া জেলার আঞ্চলিক কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় দলিত সমাজের মানুষদের নিয়ে কবিতা লিখেছেন। শুধুমাত্র আমরা আঞ্চলিক কবিতা ও গানে দলিত সমাজের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে তা নয়, লোকছড়া ও প্রবাদ প্রবচনের মধ্যেও দলিল জীবনচিত্র দেখা গেছে।

কবি ভবতোষ শতপথীর জন্ম ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার জেলার টুলিবড় গ্রামে বর্তমানে ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত। বর্ধিষ্ণু জমিদার পরিবারে কবির জন্ম হওয়ায় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় জমিদারি ও ব্রাহ্মণত্ব এই দুইই ছিল। কবি ভবতোষ শতপথী আভিজাতের এই শিক্ষা খানিকটা পেয়েছিলেন। যার ফলস্বরূপ দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া তাঁর কবিতায় আমরা কুরুচিকর ভাষা ব্যবহার, অযথা আক্রমণ এইসব পাই না। পিতার নাম শ্রীপতি শতপথী ও মাতা বিনোদবালা দেবী। টুলিবড় গ্রামেই কবির শৈশব কাটে। একমাত্র কবিদের পরিবারই ছিল ব্রাহ্মণ বাকিরা মাহাত ও আদিবাসী সম্প্রদায়। কবি শৈশব কাটে এইসমস্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। তাই তিনি বাড়ির বাইরে এইসব মানুষদের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা খুব কাছ থেকে দেখেছেন। দরিদ্র, অভাব, অনাহার, কঠোর পরিশ্রম করে জীবন কাটাতে দেখেছেন। আবার তিনি এও দেখেছেন জমিদারদের দ্বারা নিম্নশ্রেণির মানুষদের অত্যাচারিত হতে। এই দারিদ্রপীড়িত, অত্যাচারিত হওয়া কিংবা 'নামাল' কাজ করতে যাওয়া মানুষগুলো কবি ভবতোষ শতপথীকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। যার ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে তাঁর কবিতা ও গানে তাদের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। কবির স্কুল জীবন থেকেই কবিতা চর্চা শুরু হয়। ১৩৫৮ সালে 'গ্রামের ডাক' নামক একটি পত্রিকাতেই ছাপা হয় 'গ্রামের ডাক' নামেই তাঁর প্রথম কবিতা। স্বাধীনতা, বসুন্ধরা, দৈনিক সমাচার, আনন্দমেলা, শিশুসাথী, রঙমশাল, ঝাড়গ্রাম বার্তা, কৃত্তিবাস এতক্ষণ, ধ্রুপদী, কবিতা দৈনিক প্রভৃতি পত্রিকাতে কবিতা লিখে কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। 'ফিরে যা বাউন্ডারি বর' কবিতাটি 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়। কবি বাল্যকাল থেকেই শ্রেণি-শোষণের নির্মম চিত্রটি দেখেছেন। কবি মনে করতেন যে ঐসমস্ত নিম্নশ্রেণির মানুষদের কাছে পৌঁছাতে গেলে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করতে হবে। তাই তিনি তাদের ভাষাতেই ঝুমুর গান ও কবিতা লেখা শুরু করলেন। ঝুমুর গান কবিকে অসাধারণ জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিল। রোজকার দারিদ্র, নিপীড়িত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত হওয়ার যন্ত্রণা প্রভৃতির প্রতিবাদ হয়ে উঠল গানের মধ্য দিয়ে। আবার কখনও কবিতার মধ্যেও সেই সব মানুষদের জীবনচিত্র ফুটে উঠছে। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল— 'লোককবি ভবতোষ', 'অরণ্যের কাব্য' ও 'সংকলিত ভবতোষ'। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও কবিতা সংকলনে প্রকাশিত তাঁর কবিতা— 'কাস্তে', 'নির্বাচিত কবিতা', 'টুসু', 'বদানন্দের পদাবলী', 'জল পড়ছে', 'চুনারাম মাঁহাত্', 'ঢেমনা মঙ্গল', প্রভৃতি। কবিকে ডুলুং সংস্থার মঞ্চে 'অরণ্যের কথা', পত্রিকার প্রবর্তক সুধাকর মাহাত ১৯৮১ সালের ২৮ ডিসেম্বর সংবর্ধনা দেন। মণিপুরী ভট্টাচার্য ও মহাশ্বেতা দেবী কলকাতার স্টুডেন্ট হলে ১৯৮৮ সালের ২৯ মে কবিকে সংবর্ধনা দেন।

পুরুলিয়া জেলার কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম শিয়ালডাঙ্গা গ্রামে। পিতা প্রয়াত রাখহরি গঙ্গোপাধ্যায় ও মাতা প্রয়াতা খুদুবালা দেবী। শিক্ষাগত যোগ্যতা ম্যাট্রিক পাশ মূলত মায়ের উৎসাহে ছোটবেলা থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। পেশায় তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক। কবির কবিতা লেখা ছিল নেশা। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই কবিতা লেখা শুরু করেন। তার প্রথম কবিতা সাপ্তাহিক সংগঠন পত্রিকায় ১৯৫৫ সালে মুদ্রিত হয়। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পুরস্কার, সম্মান ও সম্বর্ধনাতে ভূষিত হয়েছেন। জসীমুদ্দিন-নজরুল পুরস্কার, পদ্মা-গঙ্গা পুরস্কার,জীবনানন্দ স্মৃতি পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৯৮)। কবির কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ২২টি। উৎসব ও সংস্কৃতি, প্রকৃতি, হতাশা, সংগ্রাম, নিপীড়িত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, অত্যাচারিত প্রভৃতি মানুষগুলোর কথা কবির কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। এছাড়া লোকজীবনের উৎসব, ভাদু, টুসু, বাঁদনা, লোকদেবী প্রভৃতি। ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি সমাজের দরিদ্র দলিত মানুষদের শোষণের চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল— 'নক্ষত্র পুরুষ', 'অবাক পৃথিবী', 'মাড় ভাতের লড়াই', 'চাঁদে এক কাঠা জমি', প্রভৃতি। যে সমস্ত মানুষেরা যুগে যুগে ব্রাহ্মণ তথা উচ্চবর্ণের মানুষদের দ্বারা শোষিত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত, অবহেলিত হয়ে আসছে তারাই দলিত নামে পরিচিত। প্রাচীনতম বাংলা গ্রন্থ চর্যাপদেও এই নিম্নশ্রেণির বা দলিতদের উল্লেখ আছে—

"নগর বাহিরি রে ডোম্বী তোহরি কুড়িয়া
ছোই ছোই য়াহ সে ব্রাহ্ম নাড়িয়া।
আলো ডোম্বী তোত্র সব করিবে ম সাঙ্গ।"

উচ্চবর্ণের মানুষেরা কেউ দিনের বেলা ডোমনীর ছায়া মাড়াত না। অথচ ডোমনীর সাথে অভিসারে যেত। প্রাচীন যুগেও যেমন নিম্নশ্রেণির মানুষদের শোষিত, অত্যাচারিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত হতে হয়েছে। ঠিক একইভাবে আধুনিক যুগেও আমরা উচ্চবর্ণের মানুষদের কাছে নিম্নবর্ণের মানুষদের শোষণের চিত্র দেখতে পাই। তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে আঞ্চলিক বাংলা কবিতায়।

আঞ্চলিক বাংলা কবিতায় কীভাবে দরিদ্র দলিত মানুষেরা নিঃস্ব হয়ে দু'মুঠো অন্নের জন্য গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যাচ্ছে তারই চিত্র দেখা যাচ্ছে কবি ভবতোষ শতপথীর 'জল পড়ছে' কবিতায়—

"আমি হলাম ছন্নছাড়া, ছেড়ে নিজের গ্রাম
ছিলাম হারু, হলাম হরেন-বদলে গেল নাম।
দুঃসময়ে শহর আমায় দিয়েছে আশ্রয়,
দু'তিন টাকার দিনমজুরি, আত্ম-পরিচয়।
অনেক দুঃখে রাতারাতি হলাম দেশান্তর,
রইল পড়ে বাস্তুভিটে, করুন কুঁড়েঘর।
কাজের ফাঁকে যখন তখন উড়নচন্ডী মন,

সে সব স্মৃতি স্মরণ করে ক'রছে জ্বালাতন।"

গ্রামের দরিদ্র, পীড়িত এই মানুষগুলো যখন দারিদ্রতার কারণে সারা জীবন ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে কোথাও যখন শান্তি পেল না, তখন নিজেরাই নিজেদেরকে প্রশ্ন তোলে—

"আমের মুকুল, মহুয়া ফুল, রাতের ঝুমুর গান,

মরণ বাঁচন, নাড়ির বাঁধন দেশের মাটির টান।

এমন ঘরে জন্ম দিলি, কেন আমার মা।

সারা জীবন ঘুরে ঘুরেও শান্তি পেলাম না।"

অভাব-বিজড়িত গ্রাম্য গরীব মানুষদের অল্প পরিশ্রমে রুজি-রোজগারের জীবন্ত ছবি হয়ে উঠেছে 'পাহাড় ধারের গাঁ' কবিতায়—

"ভখা গরিব গাঁ! হায়রে, বকা লকের ছা!

দিন মাঁস্যা পুয়াতি, রউদে হেঁসফেঁসাছে মা!

আতড়া ধারে গেঁড়ি ঘুঘলি পাৎড়ি ধা্রের পাত

খালা-খালি টিপলে হাটে বিকলে হবেক ভাত।

সুখের লাগর লহর পহর গাহিইছে রসের গান

গরিব মানুষ উড়াছে ত্যুঁষ কুথায় পাবিস্ ধান?

চিকন-চাকন ছঁঘ্যন্-মঁঘ্যন্ টকটক্যা যৈবন

ভইখ্ল্যা জয়্যান বহু-বিটি,শুখ্না বাছাধন।"

'হক্ কথা' কবিতায় কবি বলেন—

"পড়া আকাশ এক ফঁটাঅ নাঁয় জল,

হালের গরু বিকব হাটে চল্

রুয়া-পুতা মিছাটাই হায়রান

শুঁখায় যাছে, জরু-গরু-ধান।

মাথা কুইড়ল্যেও কুঁয়ায় নায়ঁখে জল

ইঠিন সেঠিন-অচল জলের কল,

আছে বলদা নায়ঁ বহে রে হাল,

তার দুক্ ত আছেই চিরকাল।"

.

গ্রামের গরীব দরিদ্র চাষীদের জমিদার-মহাজনেরা দাদন দিয়ে কীভাবে ভূমিহীন করে তুলেছে সেই চিত্র কবি ফুটিয়ে তুলেছেন ‘ডেড় বিঘা জমিন’ কবিতায়—

“মাহাজনের ঠিন্ এক আঢ়হা ধান দাদন লিঁয়েছিল

চাইর্ ডবল বাইড়্ কষ্যে যেখন বেজাঁয় হয়েঁ গেল

তেখন দাদুয়ে নায় পাইরক্ দিতে।

...

হামদের পুব্বা-পুরষের জমিনটা

মাহাজনে নিলাম কর্যেঁএ লিল।

হামদের আর এক ছটাকও জমিন কুথাউ নাঁয়

বাপ মুনিষ খাট্যেঁএ, বেদম কাহিল হয়্যেএ গেল।”

কবি তাঁর কবিতায় দেখিয়েছেন এলাকার দরিদ্র গরীব মানুষের জীবনচিত্র—

“গতর খাটায় খায়। ভাগচাষি,গরিবেই বঠে

ভাড়্যেঁ-ভুড়্যেঁ মাহাজনি, ধঁকা দিঁয়ে নায়ঁ হক ধনী,

খুখড়া-ডাকা ভউরে উঠ্যেঁ ঘরগুষ্ঠি একসঁঘে খাটে

পেটভরা মাঁড় ভাথ, মটা-রঠা তাঁতি বুনা ভুনি।”

কবি ভবতোষ শতপথী দলিত দরিদ্র মানুষদের বাঁদনা পরবের সুন্দর চিত্র এঁকেছেন তাঁর ‘বাঁদনা’ কবিতায়—

“পিঠা ছাঁকার মহ্যক্ আসে

মাঁস রাঁধার বাস

লইজক্যাঁয় আল্যয় বাঁদনা পরব

কাত্তিকা ধান চাষ।

...

লৈতন নিঁঘায় তেল নাঁয় দিলে

গগায় গরুর গাড়ি

.

কল্যপ লাগাঁয় ছঁড়ি সাজে

পাকাচল্যা বুড়ি।

...

গরোয়্যা দিন গহ্যাল পূজা

ঘিয়ের ছাঁকা পিঠা

মাঁয়-বহিনদের আদ্যর-সহাগ

গুড়ের লেখেন মিঠা॥"

'মকর দিনে দেখ্ ন কি হল্যয়'— এই টুসুগানের মধ্য দিয়ে কবি দরিদ্র দলিত মানুষদের দারিদ্রতা ফুটিয়ে তুলেছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাবুদের বাড়িতে যে বেগার কাজ করে থাকে সেই দুঃখের কাহিনি এই টুসুগানে ফুটিয়ে তুলেছেন—

"বড়লকের বেগ্যার খাঠ্যেঞ

ঘরের লক্ ভখহে মরে।

একবার থানা,হামদের থানার

জামানা বদ্যল হল্যয়।

...

টাঁইড়ে হাঁকায় টুসুগীত।

পেটে ভাথ্ ধান পইড়লে কি আর

শুখনা হবেক প্রেম-পীরিত্

...

মকর দিনে হামার কি হল্যয়—

পাঘ্যা ছিঁড়া বয়্যার কাড়া

ঝ্যাল্ ধুন্যেঞ লেওয়া লিলয়।"

কবি ভবতোষ শতপথীর 'মকর পরব' কবিতায় আমরা দেখতে পাই গরীব দরিদ্র মানুষদের অভাব থাকা সত্ত্বেও মকর পরব উৎসবটি তারা আনন্দের সঙ্গে পালন করছে—

"বছর দিনের মকর পরব

ভখা-দুখার ঘরে

.

ভখা দুখা মানুষ গিলা

চুড়পে গায়ের জউরে।

...

সিনান্ ঘাটে লইতন শাড়ি

পিঁধছে বহু বিটি

খুখড়া ডাকা ভউরে জাড়ে

লাগছে দাঁত কপাটি।

মকর পরব গাঁয়ের গরব

গরীব দুখীর দেশে

ভখে মরা দিনের কথা

ভুল্যেঁ যায় পুষ মাসে।"

ভাদ্র ও আশ্বিন এই দুই মাস টানের মাস। এইসময় দরিদ্র দলিত মানুষেরা দুবেলা খাবার খেতে পায় না, কোনোরকমে একবেলা মাড় ভাত খেয়ে থাকে। এই দৃশ্য কবি ফুটিয়ে তুলেছেন 'হামার মনে আছে' গানের মধ্য দিয়ে—

"হামার্ মনে আছে

ভাদর-আশন্যা টান গিল

কেমন গেছে।

কাঁসা বাটি বন্ধ্যক্ দিলে

মাঁড়্ ভাত্ জুটে একবেলা

ডেরাইডলের মাইলো খায়্যেঞ

মানুষের চৈং-হাথ্ ফুলা,

গত দিনের কথা—

....

হামদের দরকার্ বামফ্রন্ট সরকার

দিন-বদ্যল্॥"

.

পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে মকর পরব হয়। এই মকর পরব মানে গরীব দরিদ্র মানুষদের মনে আনন্দের জোয়ার আসে। সেই সময় নতুন ধান বাড়িতে আসে। এই উৎসবে দরিদ্র মানুষেরা নতুন বস্ত্র কিনে থাকে। 'মকর হাঠে কিনতে হবেক' গানে সেই নতুন বস্ত্র কেনার দৃশ্য দেখা যায়—

"মকর হাঠে কিনতে হবেক

রাঁগা ডুরা লাল শাড়ি।

আর কটা বছর গেলে ত

হামিঅ হ'ব বুড়ি।"

কবি দরিদ্র দলিত মানুষদের জীবন কাহিনি ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের ছবি তুলে ধরেছেন ঝুমুর গানের মধ্য দিয়েও—

"হামার ঘরে জ্বালা,বাইহরে জ্বালা

টাইনছি কলহুর ঘানি যে রে॥

টাটায় ছিলি গেঙের কুলি

চাষ কইবতে ভায় গাঁয়ে আলি

হামার বহু টিপছে খালা-খালি–

হানি ত' নাঁয় জানি হায় রে।"

আবারও দেখা যায়—

"পেটে নায়ঁ দানাপানি

সে কি বইলবেক ঝুমুইর শুনি-মাঁ—

গিয়ান হারাঁঞ জুঠা খাছে

মানুষে কুকুরে।"

সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষদের কাছে গ্রামের নিম্নশ্রেণির দরিদ্র মানুষেরা কীভাবে শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত হচ্ছে তার জ্বলন্ত চিত্র দেখা যায় কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মাড় ভাতের লড়াই' কবিতাটিতে—

"বাড়ুজ্যার বড়া দাপট ছিল হে

এক ঘাটে বাঘে বলদে জল খাত্য

হাঁকলো পরে লাল পাগড়ি পুলিশ আসত্য

.

লাঠি পিটা করত। হাঁড়ি বাগদি বাউরী গিল্যানকে
আর বাড়ুজ্জ্যার লাতি চিয়ারে বস্যে
ঠ্যাং এর উপরে ঠ্যাং ল্যাচায়ে বলত্য-
দ্যাখ শালারা ক্যাষণ মজা
ছুটু লক ছুটু লকের পারা থ্যাকবি
উপরে উঠবি ত ইমনি চাবুক চলব্যেক
গাঁ ছাড়া করব্য সব্বাইকে।
ইভনিং কইরে হামিদের গরীব লক গিলার শুধু জমি লয় আইজ্ঞা
ঘর বাড়ি ছাগল ভেঁড়ি মেয়্যালকের মান ইজ্জত লিত্যে লাইগল্য।”

কিংবা,

“বাগদির ছা ইখন ভাঙা ফুটা টিনের সানকি লিয়ে
ই গাঁয়ে দুয়ারে মাগো খাছো
চাল সিঝা আর মাড় ভাত।”

দরিদ্র, শোষিত, নিপীড়িত মানুষদের যেসমস্ত জমিদাররা বা সামন্তরা জমি-বাড়ি কেড়ে নিয়ে তাদেরকে ভিটেমাটি ছাড়া করেছিল। সেই সমস্ত জমিদারদের বিরুদ্ধে নতুন আইন আসে। দাম্ভিক প্রভাবশালী ক্ষমতাশীল জমিদারদের অবসান হয়। এই অবসানে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘মাড় ভাতের লড়াই’ কবিতাটিতে—

“শুরু হঁয়ে গেল লইতুন আইন
বেনামী জমি কাড়াই লিয়েঁ
গরীব লকগিলার হাতে দিয়ে দিলেন
জমি আর দলিল পাট্টা।”

আইন হওয়ার কারণে দলিত, নিপীড়িত, শোষিত বঞ্চিত মানুষদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই সমস্ত দরিদ্র দলিত মানুষেরা ভাবতে থাকে কোন জমিতে কী কী চাষ-আবাদ করবে এই ধরনের চিত্রও আমরা দেখতে পাই কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘মাড় ভাতের লড়াই’ কবিতাটিতে—

.

"আই আইজ্ঞা লালু বাউরী

সাকিম মোকাম আগরাবাইদ

লিজের হাতে চাষ আবাদ করে ধান ফ্যলাইছি

মাথার ঘাম পায়ে ফেল্যাঁই খিদা তিষ্ঠায় পুড়্যে গেইছে বুক

মাটি ফাটা রোদে ধুড়স্যে গেইস্যে গেইছে

গতর কড়ক লাগা কামড়ে হাল ঠেলেছি সকাল থ্যাকে সনঝ্যাতক্ক

ইখন সি জমিতে হলুদ বন্ন ধান

মনে লিছো আর দুঃখু থ্যাকবেন নাই হে।"

দরিদ্র দলিত মানুষদের অভাব অভিযোগ ফুটে উঠেছে কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বাবু গুল্যান যাবেক কেনে' কবিতায়—

"গরিব লোকের চালা ঘরের ইবরে ঝড়ে খড় উড়্যেছে

বাতাগুল্যান ভাইঙ্গে গেছে-সূজ্জি দেখার ফাঁকে থাকবে

রাইতের বেলা চাঁদের আলো ছিটকে পড়ে ছলাৎ কইরে।"

দরিদ্র দলিত মানুষদের কাছ থেকে জমিদার-জোতদাররা জোর করে তাদের জমি কেড়ে নিত। কিন্তু পরবর্তীকালে নতুন সরকার এলে, নতুন আইন তৈরি হয়েছে। বড়লোকদের জমি ভেস্ট করে গরীব, লাঞ্চিত-বঞ্চিত মানুষদের জমির পাট্টা দেওয়া হবে। কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মাড় ভাতের লড়াই' কবিতাটিতে লালু বাউরির চোখ দিয়ে দেখিয়েছেন তারা জমির চায়, লাঙল চায়, বলদ চায়, বীজ চায়, অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা সবই চায়—

"হাই লদীর ধারে ট্যাড় বাইদের জমিটোতে ইবার বড় ধান জন্মেছ্যেব।

সোনার বন্নধান ভাইলে দেইখল্যে চইখ থিরায়

বাইরে রা কাড়ে,মাথা নুয়ায়।

ইয় গ্যাছা গ্যাছা শিস গিল্যান হাওয়ায় লইড়ছে আর শুনা যাচ্ছ্যে।

হাজার কিসিমের আওয়াজ গজল গান।"

এইভাবে তারা বাউল মনে হাজার রকমের গান বাঁধতে থাকে। তাদের কাজকর্ম নেই, বাবুদের পৌষমাস আর তাদের সর্বনাশ। গরীব, লাঞ্চিত-বঞ্চিত, দরিদ্র মানুষদের শীতকালের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে 'দমে জাড় লাইগছে হে' কবিতায়—

.

"কাঁথা নাই বিছানা নাই নাই পরনের কনহ টেনা নাই

উদাম গায়ে হু হু করে কাঁপা।"

ধর্মঘট করলেই বাবুদের চোখ রাঙানি। শুধু তাই নয় 'কাজ নাই কম্ম নাই, ধান ঝাড়বার তাড়া নাই।' শুধুমাত্র তারা চায় তাদের সমান অধিকার দেওয়া হোক। এই সমস্ত দলিত মানুষেরা নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য প্রতিবাদ করলে তাদেরকে বাবুরা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জেল খাটাত। এইরকম শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, খেটে খাওয়া মানুষেরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে ধান চাষ করেছিল সেই উৎপাদিত ধানকে কেটে নিয়ে যাচ্ছে এবং ঝাড়খণ্ডীদের নামে দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে। যাদের গায়ে এক টুকরো বস্ত্র নেই, ঘরে চাল নেই, তারাও একসময় প্রতিবাদ করে। 'দমে জাড় লাইগছে হে' কবিতায় তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে—

"এক পুসে জাড় যাবেক নাই হে

আইসছে পউসে ফসল লুইঠের বদলা চাই। বদলা চাই।"

যাদের হারাবার কিছু নেই, তাদেরই বা ভয় কীসের? তাই তারা বদলা নিতে চায়। সকাল হলেই গ্রামের দরিদ্র মানুষেরা বাবুদের বাড়িতে কাজ করতে যায়। তারা স্ট্রাইক করে মাইনে বাড়ানোর জন্য সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তারা যে শুধুমাত্র লড়াই করছে তা নয়, স্বাধীনতা নিয়েও তাদের মনে নানা প্রশ্ন। এই দলিত মানুষদের পূর্বপুরুষেরা স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছে; লড়াই করেছে। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের ছবি ফুটে উঠেছে কবি মোহিনীমোহিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কইলকাতার লে দিল্লী কদ্দুর' কবিতায়—

"স্বাধীনতা কিনা খাত্যে পাওয়া মানুষের পেটে বন্দুকে গুঁতা?

স্বাধীনতা কি তিন রঙা পতাকার ফরফরানি?

জোতদার জমিদার কালোবাজারীর মড়লগুলার উদাম লাচ?

নাকি দিল্লী থাইকেন লেত্যাড়ে আসা শিং তুলা কাড়ার পারা

টুঁসাই মারা আইন?"

কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মধু বাউরীর স্বাধীনতা' কবিতায় দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষদের মুখে বলতে শোনা যায় তারা স্বাধীনতা চায় না, তারা চায় তাদের জীবন যন্ত্রনার কথা বলতে—

"জেল হাজত যাঁয়্যে গুলি গোলা বন্দুকের গুঁতা খ্যাঁয়্যে

ফাঁসিতে ঝুল্যে ঝুল্যে সাহেব তো খেদাই দিলি বাপ্

কিন্তুক ই কন্ কিসিমের স্বাধীনতা আল্য।"

দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ, যারা দু-মুঠো খাবারের জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে চাষাবাদ করে থাকে তবুও তাদের মনে শান্তি নেই। কেননা তারা চাষাবাদ করলেও দু-মুঠো দুবেলা ভালো করে পেট ভরে খেতে পায় না। আবার এটাও দেখা যায়, পুরুলিয়া জেলা যেহেতু খরাপ্রবণ এলাকা, তাই বৃষ্টি না হলে চাষ হয় না। ফলে কৃষকেরা আন্দোলন করে থাকে। এই কৃষক আন্দোলনের পাশাপাশি উচ্চবর্ণের মানুষেরা নিম্নবর্ণের মানুষদের কীভাবে বঞ্চিত করছে সেইসব বঞ্চিত মানুষদের কথা ফুটে উঠেছে কবির কবিতায়। নিম্নবর্ণের এই দরিদ্র দলিত মানুষেরা একজোট হয়ে উচ্চবর্ণের মানুষদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। সেই জোট বাঁধার ছবি 'মড়ল তুমার বিচার হবেক' কবিতায় দেখা যায়—

"গরীব মানুষ ভুখা মানুষ জোট বাঁইধেছ্য গাঁ শহরে

চাবুক টেনে গুলি মারেও আজকে উদের যায় না তাড়া:

ঘুঘু-চরা ভিটেয় আইসছে-তারা-দখল লিতে

মার খাওয়া সেই মুগুলাতে বদলা লিবার জ্বইলছো চুলা

মড়ল তুমার বিচার হবেক-উল্টা বাগে ঘুইরছে চাকা

বিলাই যাবেক সব ফুটানি দেইখ্‌ঠি তুমার কপালছুলা।"

দরিদ্র দলিত শ্রেণির মানুষেরা প্রথাগত শিক্ষায় কম শিক্ষিত হলেও এরা অশিক্ষিত বা মূর্খ ছিল না। এরা বাস্তব জীবন সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন ছিল। দলিতরা নিজেদের শ্রেণি সম্পর্কে সচেতন ছিল। এরা আন্দোলন করে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করে। যদিও এরা জানে প্রতিবাদ করলে এর ফল ভালো হবে না, সেইসব ভয়কে উপেক্ষা করেও তারা প্রতিবাদের আন্দোলন সামিল হয়ে থাকে। আবার তিনি তাঁর কবিতায় গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের চিত্র তুলে ধরে বলেন—

"ভাঙা ফুটা ঘরে জল ঝরছো ত ঝরছোই-

চালা বাঁধার পুয়াল নাই

গহাল্যে গরু কাড়া নাই

ধানের পাইল চালের কুচুড়ি কথায় পাবেন?

রগদাঁই রগদাঁই তাড়াই মাইরছে খিদা তিষ্টা

আঁতুড়ি ভূতুড়ি গুল্যাব ব্যারাই গেল

কিন্তুক লাচ থামছ্যে নাইখ

লাচের সংগে ব্যাঁধে লিয়েছে মনটকো!"

.

এখনকার উচ্চবর্ণের জমিদার, জোতদাররা সাহেবদের জায়গা নিয়ে নিম্নবর্ণের মানুষদের উপর অত্যাচার করছে। ভোট এলে নেতারা বলছেন জোট বাঁধতে। কিন্তু তারা আর ভুল করছে না সচেতন হয়েছেন নিজেদের লোকদের চিনে নিতে। গণতন্ত্র এলেই নেতারা গরীব দরিদ্র দলিত মানুষদের ভালোমন্দ খাবার খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে এবং টাকা দিয়ে ভোট কিনে নিতে চায়। গ্রামের গরীব মানুষদের প্রশ্ন নেতাদের কাছে গণতন্ত্র সম্পর্কে 'ইটো ক্যামন গনতন্ত্র আইজ্ঞা' কবিতায় ফুটে উঠছে—

"ইক্যামন গণতন্ত্র আইজ্ঞা

কুনু কিছুই ঠাউরাত্যে লারছি।

গণতন্ত্র মানে কি আয়েন করে গরীব গুলানকে রগড়াই মারা?

বড় লক গুলানের পেটমটাভুঁড়িতে তেল লেপাট্যে

টাকার বরাদ্দ বাড়াই দিবার ফন্দি আঁটা?

ন কি হাড়মাংস ছালচামড়া ছাড়াঁয়্যে ভুখা মানুষের

শিখা পেটে ডুগডুগি বাজাই ভূতের লাচ?"

জোটবদ্ধ হয়ে তাদেরকে প্রতিবাদ করতে দেখা যায় 'আমরা মরি নাই আইজ্ঞা' কবিতায়—

"মাঠ জ্বইলছ্যে

ক্ষেত জ্বইলছ্যে

পেটে জ্বইলছ্যে আগুন

ইবরে বাপু ঘাত্যে না পাল্যে ছিটকে পড়ইবেক

কলিজাফাড়া খুন।"

জমিদার-জোতদাররা গ্রামের গরীব মানুষদের শুধুমাত্র জমি-জমা নয়, তাদের বাড়ি-ঘর, গোরু, ছাগল, ভেঁড়া এমনকি মেয়ে মানুষদের ইজ্জত পর্যন্ত। মহাজনেরা বেশি সুদে ধান চাষ করতে দেয় সেই ধান সময়ে শোধ দিতে না পারলে চাষ করা জমির ধান জোর করে কেটে নেয়। এমনকি প্রতিবাদ করলে লাঠিয়াল দিয়ে তাদের ওপর অত্যাচার করে। এরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই কবির 'মাড় ভাতের লড়াই' কবিতাটিতে—

"দ্যাখ শালারা ক্যামন মজা

ছুটু লক ছুটু লকের পারা থ্যাকবি

উপরে উঠবি ত ইমনি চাবুক চলব্যেক

গাঁ ছাড়া করব্য সবকাইকে।

ইমনি কর হামদের গরীব লল গিল্যার

শুধু জমি লয় আইজ্ঞা

ঘর বাড়ি ছাগল ভেঁড়ি মোয়ালকের ইজ্জত লিতে লাইগল

মাছে ঘি ল্যেশে ভুটরা গতর লড়াই লড়াই

বাগান বাড়িতে ফুরফ্যুরা হাওয়া খাত্য।"

গ্রামের শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত, দরিদ্র, খেটে খাওয়া মানুষেরা যখন জমিদার-সামন্তদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর তুলতে দেখা যায় কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লাফরা মাহাতর জবানবন্দী'তে—

"যারা আমাকে মিছা মামলায় জেলে ঢুকাল্য

যারা আমার বউটোকে ছেল্যাটোকে ভখে মাইরল্য

যারা আমার ভিটামাটিতে বেনাহক ঘু ঘু চরাল্য

তারাকে তামাম দুনিয়া থাহিকে শিকড় বাকড় সুদ্ধা

উখড়াই ফেইলব

আছড়াই মাইরব চাট্টান পাথরে।"

পুরুলিয়া জেলা রুক্ষ মাটির দেশ এই অঞ্চলে চাষাবাদ খুব একটা ভালো হয় না, তাই এখানকার মানুষেরা চাষাবাদ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে থাকে। করম, ভাদু, টুসু, বাঁদনা প্রভৃতি আঞ্চলিক উৎসব, অনুষ্ঠান উদযাপন করে থাকে এই দরিদ্র শ্রেণির মানুষেরা। সারা রাত্রি ধরে চলতে থাকে ছৌ নাচ ও ঝুমুর গানের উৎসব। এমনকি প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যেও আমরা এই দলিত শ্রেণির মানুষদের জীবনচিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায়। এই উৎসবের ছবি ফুটে উঠেছে 'দমে জাড় লাগইছে হে' কবিতায়—

"ছিলা পিলার লইতুন জামা কাপড় চাই

ডগডগ্যা লাল পেড়্যা শাড়ি বিবেক বউ।"

কেউ ধর্মের নামে বেজাতি করুক এটা দরিদ্র দলিত শ্রেণির মানুষেরা মেনে নিতে পারে না। এই শ্রেণির মানুষেরা নিজেদের উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনপাত করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এরা পান্তা ভাতের জল খেয়ে নেশা করে থাকে। অনুষ্ঠানের মূল বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকে ধমসা-মাদল। দরিদ্র মানুষদের এক অন্যতম উৎসব হিসেবে পালিত হয় এই ভাদু উৎসব। প্রচলিত আছে এই ভাদু হল পুরুলিয়া জেলার কাশীপুরের রাজার কন্যা। এই ভাদুর অকাল মৃত্যু হয়। রাজা তার মৃত্যুর দিনটিকে স্মরণ করে ভাদু উৎসব প্রচলন করে

থাকেন। ভাদ্র মাসে ভাদু উৎসব হয়ে থাকে। এই ভাদ্র মাসে দরিদ্র দলিত মানুষের জীবন যাপনে অভাব দেখা যায়। তারা দুবেলা দু-মুঠো ভালো করে পেট ভরে খেতে পায় না তবুও তারা দারিদ্রতাকে উপেক্ষা করে ভাদু উৎসব পালন করে থাকে। এরা এই ভাদু উৎসব উৎযাপনের সময় নানা ধরনের গান করে থাকে। 'ভাদু পুজোটা' গানের মধ্যেই তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—

"জলে হেলা জলে খেলা জলে তুমহার কে আছে

লিজের মুনে ভাইবে দেখ জলে শ্বশুর ঘর আছে।"

এই ভাদু উৎসবে সারারাত ধরে চলতে থাকে নানা ধরনের ঝুমুর গান ও ছৌ নাচের অনুষ্ঠান। এই ভাদুকে নিয়ে তারা নানা ধরনের ঝুমুর গান গায়তে থাকে। এই ঝুমুর গানের মধ্য দিয়েই ভাদুকে নানা আন্দোলন দেখাতে চায়। তারা ভাদুকে নিয়ে নানা ধরনের বিচিত্র স্বপ্নও দেখে থাকে।

পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে হয় টুসুমেলা। টুসু পূজার মধ্য দিয়েও এই অঞ্চলে মানুষদের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। এরা সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষদের টুসু ভাসানের গান গেয়ে শোনায়। 'পুরুল্যার টুসু ভাসানের মেলা' গানে তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে—

"পুরুল্যার তুসু পরবটো দেইখে যাবেন বাবু

মন রায়ও দু'একটা ফটঅ তুইলে দিবেন

কাগজে দেইখেন দিবেন গান গুলান

ইগুলা গাঁওয়ালী গান বেটে দমে ভাল লাগবেক।

...

চিকচিক্যা বালির যি পাসটোয় তিরতির কইরছে

ঠিক আয়নার পারা কাঁসাইয়ে জল

সি ঠেন টোয় টুসুগুলো সব ভাসাই দিলেক

ভাঁড়াই-ভাড়াই দেইখলেন কেনে।"

দরিদ্র দলিত সমাজের মানুষেরা টুসুকে তাদের বাড়ির মেয়ে হিসাবে দেখে। মেয়ে হিসেবেই তার পূজোও করে থাকে। তাকে নিয়ে গানও বাঁধে। সেই গান বাঁধার ছবি আমরা দেখতে পাই 'টুসু ভাসান মকর পরব' গানে—

"সাধের তুসু ঘরকে আল্য বৈসতে দিলাম পিঁড়া

খাইত্যে দিলম দৈ মাইখেগো নতুন ধানের চিঁড়া

বউ বিটিরা দাঁড়াই দেখে টুসুর রূপের ছটা—
সবকে দিলম আধ চিরি পান টুসুর লাইগ্যে গটা
খাও টুসু মা খাও টুসু মা খাত্যে কেন লাজ—?
ই পউসে ধানঝাড়া আর ঘরে দেদার কাজ।”

দরিদ্র দলিত মানুষদের বাঁদনা পরব আর এক উৎসবের দিন। এই পরবের গানের মধ্যে দেখা যায় দরিদ্র দলিত মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনি। ‘বাঁদনা পরব সুখের গরব’ গানের মধ্যে দলিত মানুষদের কান্না কবিদের গানের সুর হয়ে ওঠে—

“বাঁদনা পরব নিয়ে আল্যেক গরব করার দিন
কার সঙে কার,গোপন পিরিত-কাছের মানুষ চিন্।
মহুল রসের ঝইরছে বাদল-নেশায় মাতে মন
হুদকে উঠে কন্ হুচকে তিতির ডাকা বন?”

এমনকি এই বাঁদনা পরবের গানের মধ্যে দেখা যায় একে অপরের প্রতি প্রেম নিবেদনও করে থাকে। ‘বাঁদনা পরব’ গানে সেই ছবি দেখা যায়—

“কাজলি কেনে সাজনি এত? বলনা খুইলে সিধা
চইখে তাকে উলফা দিছে কিসের লাইগে খিদা
কাকে খাবি? ই বতরে ছাড়াই চুইষে খা—
ছলক্যে পড়ে কন্ পিরীতে জুয়ান ছুঁড়ির গা?
ঘুম গেইছে-রাইত জাগা ঘুম-বুকে লদীর বান
টানছে জোরে হাত পা ধইরে চরা স্রোতের টান।”

এই দরিদ্র পীড়িত মানুষের জীবনযাত্রা নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান। কখনো এদের জীবনে আছে জোয়ার আবার কখনো আসে ভাটা। জোয়ার যখন আসে তখন এদের জীবনে গানের নতুন নতুন সুর আসে। সেই সুরে এই অঞ্চলের শহর, গ্রাম ডুবে যায়। কবি এই সমস্ত মানুষদের জীবনচিত্র জাওয়া গান, ভাদু গান, টুসু গান, ঝুমুর গান ও ছৌ নাচের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর লেখা কবিতা ও গানে প্রচলিত বাংলা ছন্দের ব্যবহার করেছেন।

স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। যথা,
স্বরবৃত্ত ছন্দ-

"মরা পাবড়া/আল্য নাই/দাদন কুথা/পাই
পউস মাসে/জাড়ে মরি পরার ট্যেনা/নাই।
টুসু টুসালু/মকর পরব/ঘুরাই দিলেক/মুড়
খুদ কুঁড়া নাই/গেইছে চুলায়/চাঁছির পিঠা/গুড়।"

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ-

"মাঠ জ্বইলছে/
ক্ষেত জ্বইলছে/
পেট জ্বইলছে/ আগুন।/
চইখ থাইকতে/ কানা হয়্যেঁ থাকার/
বড় দুঃখু বাপ।"/

প্রত্ন মাত্রাবৃত্ত ছন্দ-

"কাজ কইরব্য/ নাহ্য লিব/ সইব কিসের/ চইথ রাঙানি/
বাপের বেটা/মরদ আছ/রাই ঘরে ঘরে/সেই ফুটানি/"

এমনকি ঝুমুর, করম, ভাদু, টুসু প্রভৃতি গানগুলিতেও দলিত জীবনের দারিদ্রতা ফুটে ওঠে। যেমন-

১। "পাকা 'ফুটার' দিন আল্যঅ
ভখা ভাদর আশ্বিন গেল
কাত্তিক মাসে আগ্ ঝলকা দেয় শিষে
লঘনা বড়না দু'রকম ধান চাষে।"

২। "ঘর ভিতরে ঘুরঘুর্যা পকা
পিঁদ্যাড়ে গাঢ়া তাড়ে,
একলা হামি পাত তুইলতে
নায়ঁ যাব পাতড়ি ধারে...।"

৩। "হামার টুসুর একটা বেটা গো, গরু চরায় হঁদ্ ট্যাঁড়ে-
ভকে শসে কাঁদে, বাছার পেট ভরে নাঁঞ জল মাঁড়ে।"

.

৪। “এক ডুড়া ঢালা মাড়। মুঠা দুয়েক ভাত হে

সেই দেখে বহু কাঁদে সারা রাত হে।”

৫। “চল মিনি আসাম যাব

জড়া পাখা টানাব

কানের তলে মাছি করে গান

হায় গঙ্গারাম ফাঁকি দিয়ে

পাঠালী আসাম।” (টুসুগান)

কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় অত্যন্ত সচেতনভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার এই অঞ্চলের দরিদ্র দলিত মানুষদের ভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি তাঁর ‘মাড় ভাতের লড়াই’ কাব্যগ্রন্থে কুর্মী ভাষার বা কুড়মালী ভাষার প্রয়োগ করেছেন। এই ‘মাড় ভাতের লড়াই’ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে দেখা যায় সামন্তদের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত দরিদ্র দলিত মানুষেরা প্রতিবাদ করেছে। কবির বেশিরভাগ কবিতাই সামন্ত-জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কবিতা। জমিদাররা তাদের জমিদারি টিকিয়ে রাখার জন্য গরীব চাষীদের উপর অত্যাচার করত। কবি এইসব গরীব দরিদ্র মানুষদের মুখের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন।

সাহিত্যকে সমাজের দর্পণ বলা হয়। কেননা সাহিত্যের মধ্যেই সমাজের জীবনচিত্র ফুটে ওঠে। বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার কবিরা তাঁদের কবিতার মধ্য দিয়ে বহু পুরোনো লোকসংস্কৃতি ও তাদের দৈনন্দিন জীবনচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। কবিরা যেহেতু এই অঞ্চলেরই বাসিন্দা, তাই এই অঞ্চলের দরিদ্র দলিত মানুষদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে, সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষের দ্বারা নিম্নশ্রেণির মানুষদের শোষিত হতে। পরবর্তীকালে ঐসমস্ত মানুষদের জীবনকাহিনি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ভবতোষ শতপথী, অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, ছত্রমোহন মাহাত, ভূপেন মাহাত, অভিমুন্য মাহাত, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ বসুরায়, সৃষ্টি মাহাতো, অনিল মাহাতো, গৌতম দত্ত প্রমুখ কবিদের কবিতায় ফুটে উঠেছে। বর্তমানে কোনো ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ের আদিবাসী বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে। এমনকি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মতো দলিত শ্রেণির মানুষেরাও তাদের পূজা-অর্চনা, উৎসব-অনুষ্ঠানে আধুনিকতা নিয়ে এসেছে। স্কুল-কলেজে জাতি পরিচয় বললে তারা তপশীলি জাতি বা উপজাতি বলেন; কামার-কুমোর, মুচি, মেথর, হাড়ি, বাউরি, ডোম বলে না। শুধুমাত্র শীতলা, মনসা, ধর্মঠাকুর, করম, গ্রামদেবীর পূজা নয়, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, সরস্বতী পূজাকেও তারা নিজের পূজা বলে মনে করে। এমনকি বর্তমান দিনে আধুনিক পোশাক পরে পাতানাচ বা করমপূজাতে অংশগ্রহণ করতেও দেখা যায়। আধুনিকতা পূজার প্রসাদের মধ্যেও এসেছে। বিশ্বায়নের যুগে দলিত মানুষগুলোর দারিদ্রকে দূর করতে হবে। জাতপাত ও উন্নয়নকে আর রাজনীতি হতে দেওয়া যাবে না। উন্নয়নের সাধারণ মাপকাঠি-রাস্তা, পরিবহন, জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিষয়গুলি মেটাতে হবে। শহর ঝাড়গ্রামের উপর যখন দেখা যায় পেটে একটা বাচ্চা, কোলে একটা, পিঠে একটা, কোমরে কাঠারি, মাথায় করে কাঠের বোঝা তখন বুঝতে পারা যায় দলিত কারা—

"কাঠ নিয়ে বাজারে গেলে,
পেটে দুটো দানা মেলে, দশ
আজ কেন বাবুই করে মানাগো,
উহাদের বন নাহি ছিল জানা।"

এই সব দেখে মনে পড়ে যায় মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকারে'র কথা। সিংধুয়ের লোধা মায়ের এখনো কেন ছেলের বয়স জিজ্ঞাসা করলে বলে—"সিঁধে ঢোকার সময় হয়েছে।" লোধারা এখনো কি এই অপরাধ বয়ে চলবে? একবিংশ শতাব্দীতে এসেও কি আমরা এর পরিবর্তন করতে পারব না?

তথ্যসূত্র:

১. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, দলিত সাহিত্য: শিল্প প্রকরণ ও নন্দনতত্ত্ব, মনোহরমৌলি বিশ্বাস ও শ্যামলকুমার প্রামাণিক (সম্পা), শতবর্ষে বাংলা দলিত সাহিত্য, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৯, পৃ. ৪১
২. চ্যাটার্জী, দেবী, পতিত, কলিকাতা, ২০০১, পৃষ্ঠা. ১৫৪
৩. তদেব, পৃষ্ঠা. ১৫৪
৪. চ্যাটার্জী, দেবী, মানবাধিকার ও দলিত, কলিকাতা, ২০০১, পৃষ্ঠা. ১৬২

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ:

১. গঙ্গোপাধ্যায় মোহিনীমোহন, মাড় ভাতের লড়াই (কাব্য), এ. কে. ডিস্ট্রিবিউটার্স, পুরুলিয়া, পঞ্চম সংস্করণ, মাঘ ১৪১৪ (প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৯৩)
২. শতপথী ভবতোষ, ভবতোষ রচনা সমগ্র, বর্ণমালা, ৯/৪ বি প্যারিমোহন সুর লেন, কলকাতা; ৬, ১লা বৈশাখ, ১৪২৫

সহায়ক গ্রন্থ:

১. সিংহ শান্তি, টুসু লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা; ৬৮, ১৪০৫
২. সিংহ শান্তি, 'ভাষা আন্দোলন ও টুসু গান', দেবপ্রসাদ জানা সম্পাদিত অহল্যাভূমি পুরুলিয়া ২য় পর্ব দীপ প্রকাশন, কলকাতা; ৬, ২০০৪

পত্র-পত্রিকা:

১. গণশক্তি মুখপত্র- ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১৫, কলিকাতা, পৃষ্ঠা. ৭